রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ নির্মাণের মূল স্থপতি

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব অসুস্থ অবস্থায় কাশীপুরে অবস্থানকালেই তাঁর ভাববাহী যুবক শিষ্যসন্তানদের একত্রিত করে রেখে তাঁদের মনে তাঁর জীবনাদর্শকে কেন্দ্র করে একটি সঙ্ঘের সূচনা করে যান। অসুস্থতার পূর্বে দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে তাঁর শিষ্যেরা, যাঁরা পরে সন্ন্যাসব্রতে স্থিত হয়েছিলেন, কখনই একসঙ্গে তাঁর কাছে বাস করেননি। এই সুযোগ যেন শ্রীরামকৃষ্ণই অসুস্থতার ছলে করে দিলেন এবং নরেন্দ্রনাথকে জানালেন এইসব বৈরাগ্যবান যুবকদের ভার তাঁকে নিতে হবে, যাতে তাঁর প্রয়াণের পর এঁরা গৃহে ফিরে না যান। অবশ্যই একথা স্বীকারে বাধা নেই যে একত্রিত হয়ে না থাকলে তাঁরা গুরুর জগৎকল্যাণসাধনের যে-মহান আদর্শ, ধর্মীয় উদারতা ও নিঃস্বার্থ জীবসেবার বাণীসহায়ে, তা ভবিষ্যতে ফলবান করতে অপারগ হবেন। এই ভাবনার বীজটিকেই যেন স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালের ১ মে আনুষ্ঠানিকভাবে বপন করে দিয়েছিলেন উপস্থিত কিছু অনুরাগী গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যদের মনে, বলরামবাবুর বাড়িতে রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন স্থাপনের জন্য আহূত সভায়। এই সূচনাপর্বেই স্বামীজী শ্রীমা সারদা দেবীকে এই সন্ন্যাসিসঙ্ঘের পূর্ণ কর্তৃত্বভার অর্পণ করে সকলের জ্ঞাতার্থে এই বার্তা দিলেন যে, তাঁদের গুরুর শরীরত্যাগ হলেও তাঁর অত্যুচ্চ জীবনাদর্শ—জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের সমন্বয়ী ধর্মীয় ভাবধারাটি যাঁর কায় মন ও বাক্যে রূপায়িত হয়েছে পূর্বেই আরও অধিক সফলভাবে, তিনি শ্রীমা সারদা দেবী। কারণ স্বামীজী লক্ষ করেছিলেন—এক, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বল্পায়ু জীবনটি অধ্যাত্মক্ষেত্রে যতখানি প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পেয়েছে, প্রত্যক্ষ সংসারজীবনের ক্ষেত্রে, প্রতিদিনের গার্হস্থ্য জীবনচর্যায় তাঁকে সেভাবে ধরা যায়নি। দুই, দক্ষিণেশ্বরে নহবতে থাকাকালীন শ্রীশ্রীমা সকলের দৃষ্টির অন্তরালে থেকেই, ঠাকুরের কাছে আগত যুবক ভক্তদের তো বটেই, অন্যান্য ঘনিষ্ঠদেরও ঠাকুরের কথামতো আহার্য প্রস্তুত করে পাঠাতেন ও তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে তৃপ্ত হতেন। তিন, শ্রীমা ঠাকুরের প্রেরিত স্ত্রীভক্তদের সঙ্গে পরমাত্মীয়ের মতন মিশতেন; অনেক সময়েই তাঁদেরকে নিজের ওই ছোট্ট ঘরখানিতে রাত্রিবাসেরও ব্যবস্থা করে দিতে ইতস্তত করতেন না। চার, স্বামীজীর একথাও কর্ণগোচর হয়েছিল যে, স্বামীর অমত জেনেও মা যুবক শিষ্যদের উদরপূর্তির জন্য বেশি পরিমাণ আহার্য দিতেন মাতৃত্বের অমোঘ

টানে, নিজ পরিশ্রম গ্রাহ্য না করেই। সমাজের পতিতা কন্যাদের প্রতি তিনি করুণাপরবশ হয়ে তাদের পুণ্যসঙ্গ দান করতেন নির্জন দুপুরে বিশ্রামের সামান্য সময়টুকুতেও—ওই একই মাতৃত্ববোধে, ঠাকুরের নিষেধ না মেনেই। এই সর্বপ্লাবী মাতৃপ্রেম থেকেই মা ঠাকুরকে জানিয়েছিলেন, তাঁকে মা বলে কেউ কিছু চাইলে তিনি না দিয়ে থাকতে পারবেন না; আরও বলেছিলেন, ‘‘তুমি তো শুধু আমার ঠাকুর নও, তুমি সকলের।’’ এইসব দিক বিচার করেই স্বামীজী বুঝেছিলেন শ্রীশ্রীমার অনাসক্ত ও ব্যক্তিত্বময় জীবনচর্যাটিই সঙ্ঘ পরিচালনায় ও তার পুষ্টিসাধনে অধিক সফলভাবে কার্যকরী হবে—একইসঙ্গে যিনি গৃহিণী, মাতা ও সন্ন্যাসিনীর ভূমিকায় সমভাবে স্থিত, যাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক ও ব্যাবহারিক উভয় জীবনেরই সুসমন্বয় ঘটেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর তুলনায় মায়ের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ জীবন স্বামীজীর এই ভাবনার অনুকূলেই গিয়েছিল।

শ্রীমা যখন ঠাকুরের শরীরত্যাগের পর তীর্থভ্রমণে গিয়ে ত্যাগী শিষ্যদের স্থায়ী বাসস্থানের জন্য তীর্থদেবতাদের কাছে মাথা খুঁড়েছেন, গোলাপ মার ভাষায় নুড়িটি পাথরটির কাছে মাথা ঠুকে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছেন, তখনও স্বামীজী ততটা গঠনমূলকভাবে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেননি বা বলা যেতে পারে তাঁর মনে নিশ্চিতভাবে এর উপযোগিতা বা কার্যকারিতা ধরা পড়েনি। অর্থাৎ যতটা অগ্রসর হলে ভাবনাটি ‘দানা’ বাঁধবে বা একটি ‘concrete’ আকার ধারণ করবে, তা হয়নি। এর প্রমাণ হিসাবে সিস্টার ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথার উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্রিস্টিন জানিয়েছেন, ভারত পর্যটনের পর স্বামীজী যখন বিদেশে, তখনও তিনি সঙ্ঘ বা organisation গঠন বিষয়ে দোলাচলে রয়েছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমা অনেক আগে থেকেই, বা বলা যেতে পারে ঠাকুরের সঙ্গে বিবাহিত জীবনের শুরু থেকেই যেন এ-বিষয়ে এক নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে রয়েছেন। শ্রীমা সারদা যখন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে সেবার বাসনায়, তখনই দেখছি এই ষোড়শী লজ্জাশীলা বধূটি—ভগিনী নিবেদিতার ভাষায় যাঁর শ্রীমুখটি তাঁর স্বামীও ভাল করে কোনওদিন দেখেননি—তাঁর ঈশ্বরদর্শনকারী, আত্মজ্ঞানী পতিকে জগৎকল্যাণের মহান আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন করে বলছেন, ‘‘তুমি তো শুধু আমার ঠাকুর নও, তুমি সকলের।’’ তখনও কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব এমন ভাবনাটি কারও কাছেই ব্যক্ত করেননি, নরেন্দ্রনাথ তখনও রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হননি। আবার পরবর্তী কালে কলকাতায় প্লেগ মহামারির সময় যখন মঠের জন্য ক্রীত জমি স্বামীজী অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিক্রি করে দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন রোগাক্রান্ত দরিদ্রদের সেবার জন্য, তখন মা কিন্তু স্বামীজীর দয়ার্দ্র হৃদয়কে প্রশ্রয় না দিয়ে বললেন, যে-কাজে বহুলোকের স্থায়ী কল্যাণসাধন করা যাবে, তাকে সাময়িক একটি সমস্যা মেটাতে বিনষ্ট করা যায় না। স্বামী যোগানন্দ বলেছেন, স্বামীজীর দরদি, আবেগপ্রবণ মনকে সংযত করতে একমাত্র মা-ই পারতেন। তাঁর অকাট্য যুক্তিতেই স্বামীজী শান্ত হয়ে যেতেন।

শ্রীশ্রীমা জীবনের শুরুতেই দেখিয়েছেন ক্ষুধায় কাতর দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের মাতৃহৃদয় দিয়ে সেবা। অতীব দারিদ্র্য সত্ত্বেও আমরা তাঁকে দরাজহৃদয় হতে দেখেছি। প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে উদারহস্ত হওয়া অসম্ভব নয় শৈশবেও, কিন্তু যাদের একগলা জলে নেমে দলঘাস কাটতে হয় শৈশবে, পঙ্গপালে-খাওয়া ধান কুড়িয়ে আহার্য সংগ্রহ করতে হয়, সেখানে অন্যকে উদারভাবে সাহায্য করা সাধারণ মনের পরিচয় নয়। কৈশোর ও যৌবনে যেমন, তেমনি পরবর্তীতেও যখন শ্রীশ্রীমা রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র নেত্রী, তখনও তাঁর একই

অপরিবর্তিত মনোভাব—যেকোনও প্রতিকূল অবস্থাতেও যা অনাসক্তি ও প্রেমময়তা থেকে বিচ্যুত হয়নি। সকল কর্মই তিনি সম্পাদন করছেন স্থির, শান্ত এক অবিচল ঈশ্বরপরায়ণতা নিয়ে, সেখানে নেই কোনও অশিক্ষাজনিত অসংস্কৃত গ্রাম্য সংকীর্ণতা বা কোনও অহমিকার প্রকাশ, আবার তেমনি নেই অযৌক্তিক দীনতাবোধ। স্বামী অভেদানন্দজী তাঁর সম্বন্ধে যে-অসাধারণ স্তবটি রচনা করে তাঁকে শুনিয়েছিলেন—'প্রকৃতিং পরমাং', যাতে শ্রীশ্রীমার পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক সত্তা সম্বন্ধে অনন্যসাধারণ গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে, সেটি শুনে তিনি বিশেষ প্রীত হন ও মহারাজকে আশীর্বাদ করে বলেন, ''তোমার মুখে সরস্বতী বসুক।'' এখানে দেখি মা একটুও সংকুচিত হননি বা বলেননি, ''এসব আমার সম্বন্ধে কী লিখেছ!'' শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু নিজের প্রশংসার উত্তরে হয় জগন্মাতার কৃতিত্ব দিয়েছেন নয়তো নিজের সম্বন্ধে জানিয়েছেন যে তিনি 'মূর্খোত্তম।' শ্রীশ্রীমা এসব দীনতা প্রকাশের ধারকাছ দিয়ে যাননি। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর সঙ্গে কয়েকটি দিন কাটিয়ে, অহোরাত্র তাঁকে দেখে বুঝেছিলেন, ইনি এক অসাধারণ মহিলা, যিনি তাঁর কাছে আগত সর্বশ্রেণির ব্যক্তির সব ভাব বুঝতে ও সবরকম সমস্যার—সে সামাজিক বা ধর্মীয় যাই হোক না কেন—তার সমাধানে সর্বতোভাবে পারংগম, অথচ নেই কোনও আত্মম্ভরিতা বা অপ্রতিভতা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন শ্রীশ্রীমাকে জানান, ''তোমাকে অনেক কাজ করতে হবে'', তখনই মা একবার বলেছিলেন, ''আমি মেয়েমানুষ, আমি কি করতে পারি!'' কিন্তু ঠাকুরের অবর্তমানে স্বামীজী যখন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নেত্রীরূপে তাঁর নাম ঘোষণা করেন, তখন কিন্তু শ্রীশ্রীমার কণ্ঠে আপত্তি শোনা যায়নি। আমাদের মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে মা যেন জানতেন এই ভার তাঁকে নিতে হবে, যেজন্য বৈবাহিক জীবনের প্রায় শুরু থেকেই তার প্রস্তুতি যেন তিনি নিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে যুগ্মজীবন যাপনে অহরহই শ্রীশ্রীমার এই ভবিষ্যচিন্তা যেন প্রকাশ পেয়েছে যে তাঁর ও ঠাকুরের গার্হস্থ্যজীবনের তাৎপর্য শুধুমাত্র সাংসারিক কতকগুলি কর্মের মধ্য দিয়ে, সেবার মধ্য দিয়ে কালযাপন নয়। এ-যৌথজীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ পৃথক, দায়ও সুদূরপ্রসারী। যে-স্বামীকে তিনি সর্বদা অনুসরণ করেছেন ঐকান্তিক পাতিব্রত্যে—অভেদানন্দজী যেমন লিখেছেন 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং', 'তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং'—সেই তাঁরই আহার্যের পাত্রটি অন্যের হাতে তুলে দিয়েছেন স্বামীর অমত জেনেও; সাধারণ বুদ্ধির নিরিখে যাকে মেলানো বা মেনে নেওয়া যায় না। উপরন্তু স্বামীর আহারে বিঘ্ন হচ্ছে দেখেও নিজ সিদ্ধান্তে স্থির থাকা—''আমায় মা বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারব না।'' আবার তার সঙ্গে এই স্পর্ধিত উক্তি তাঁকে সচেতন করে দিতে যে শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু তাঁর ভর্তা মাত্র নন, তিনি জগতের সকলের জন্য এসেছেন। আমরা বিস্মিত হলাম দেখে যে ঠাকুর একথার কোনই প্রতিবাদ না করে নিঃশব্দে আহার করে নিলেন। এই রহস্য অনুসন্ধানে এই তত্ত্বটিই উদ্ঘাটিত হচ্ছে না কি যে এই দম্পতি পরস্পরের অপার্থিব সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞাতই ছিলেন, শুধু জগতে পরস্পরকে পরিচিত করাতে এই লীলা-অভিনয়!

আমাদের মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন শ্রীমায়ের মধ্যে এইরকম সর্বজনীন মাতৃসত্তার প্রকাশ দেখতে চাইছিলেন এবং এক্ষেত্রে সেটি জেনে যেন নিশ্চিন্ত হলেন। আবার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনও যে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, নয় শুধু অনিকেত সন্ন্যাসী বা তপস্বীর জীবন যেখানে জপধ্যান, তীর্থপর্যটন, ঈশ্বরপ্রণিধান বা দর্শনই উদ্দেশ্য—একথাও যে শ্রীশ্রীমা অবহিত আছেন, তা তাঁর মুখে শুনে ঠাকুর

যেন খুশিই হলেন।

যখন সারদা দেবী দক্ষিণেশ্বরে বসবাস করতে এলেন, আমাদের ভাষায়, স্বামীর সঙ্গে সংসারধর্ম পালন করতে এলেন, তখন তিনি একটু পরিণত বয়সের—ষোলো বা মতান্তরে সতেরো বছরের। একদিন পদসংবাহনকালে তাঁকে সহসা ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, শ্রীমা কি তাঁকে সংসারপথে টানতে এসেছেন? তৎক্ষণাৎ মায়ের সপ্রতিভ উত্তর ছিল, তিনি স্বামীকে সংসারপথে কেন টানতে যাবেন, তাঁর ইষ্টপথেই সহায়তা করতে এসেছেন। মনে করার কোনও কারণ নেই যে মা তাঁর তপস্যাপরায়ণ পতিকে সাময়িকভাবে স্বস্তি দিতে ভেবেচিন্তে এই উত্তরটি দিয়েছেন। প্রশ্ন জাগে, গ্রামের এই লেখাপড়া না জানা সরল, লজ্জাশীলা বধূটি 'ইষ্টপথ' বলতে কী বোঝালেন? ঠাকুর তো এই কঠিন, অপরিচিত শব্দটি উচ্চারণ করেননি যে মা সেইটিই পুনরাবৃত্তি করে বোঝাবেন! ঠাকুরের ইষ্টদেবী ছিলেন কালী, তিনি তাঁর পূজা দীর্ঘদিন ধরে করেছেন মন্দিরে, পরে তাঁকে দর্শন করে ধন্য হয়েছেন তীব্র তপস্যা সহায়ে। শ্রীমা কি তবে বুঝিয়েছেন, তিনিও ওই মা কালীর সেবাপূজায় স্বামীর সহযোগিতা করবেন? তাও তো মনে হয় না। কারণ শ্রীমা স্বামীর সঙ্গে একটিবারও কালীঘরে গিয়ে পূজাদি দেখেননি; সেবা-আরাধনা বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করেছেন বলেও জানা যায় না। পরবর্তী কালেও কোনও সেবক ভক্ত মাকে প্রশ্ন করে তাঁর উত্তরটি জেনে নেননি। আমাদের আজ বড় আফশোস হয় এই বিষয়ে। তবে মায়ের জীবনচরিত্র অনুসরণে আমাদের মননে ধরা পড়ে যে মা বুঝিয়েছিলেন, ঠাকুরের জীবনের যে-উদ্দেশ্য বা তাঁর জীবন ও সাধনার দ্বারা জগতের যে-প্রয়োজন সাধিত হবে বা জগন্মাতা তাঁর জীবন অবলম্বনে যে-ধর্মীয় বার্তা জগতে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করবেন, সেটিই তাঁর ইষ্টপথ। মা বলতে চেয়েছেন তিনি ঠাকুরকে সেই পথেই সহায়তা করবেন। নিজ জীবনের গভীর সত্যটি তিনি ব্যক্ত করেছেন যে তিনি সকলের মাতা—মাতৃত্বের মহিমাতেই সর্বদা স্থিত থাকবেন, এটিই তাঁর জীবনাদর্শের মূল সুর যেখানে তাঁর প্রিয়তম শ্রীশ্রীঠাকুরেরও অগ্রাধিকার নেই; তেমনিভাবেই ঠাকুরেরও যে দেহধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য জগতের মঙ্গলসাধন, অর্থাৎ তিনি 'সকলের জন্য এসেছেন,' এই মহান বার্তাটি মা যেন ঠাকুরকে জানিয়ে দিলেন।

আবার দেখি মাও কৌশলে জেনে নিলেন ঠাকুর তাঁকে কী চোখে দেখেন বা তাঁর স্বরূপটি ঠাকুরের কাছে ধরা পড়েছে কী না। মা ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন, "আমাকে তোমার কী বলে মনে হয়?" দিব্যজ্ঞানে আরূঢ় ঠাকুর তৎক্ষণাৎ জানালেন, যে-ভবতারিণী মন্দিরে পূজা নিচ্ছেন ও তাঁর জন্মদাত্রী চন্দ্রমণি দেবী যিনি নহবতে অধুনা বাস করছেন, এঁদের সঙ্গে শ্রীসারদা দেবীকে তিনি একাত্মরূপে, একই সত্তারূপে দেখেন সত্যসত্যই। মা অতি বুদ্ধিমতীর মতো এই প্রশ্নটি তাঁর পতিকে করায় এবং তার উত্তরটি আমাদের গোচর হওয়ায়, আমাদেরও মাকে কিঞ্চিৎ ধারণায় আনতে সুবিধা হয়। আমরা দেখলাম মা এই উত্তরে প্রীত ও সন্তুষ্ট হলেন, সাধারণ সংসারী নারীর ক্ষেত্রে যা হওয়া সম্ভব ছিল না। এক্ষেত্রে হয় পতিকে পত্নীর রোষে পড়তে হত, অথবা পতির মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে পত্নীর সন্দেহ জাগত। এখানে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হল না যে এই দিব্যদম্পতি উভয়ে উভয়কে চলমান সংসার-সমাজের বাঁধাধরা স্বার্থ-সম্পর্কের ঊর্ধ্বে চিনেছেন এবং আমাদেরও চেনালেন। এঁদের যৌথজীবনের কার্যাবলি, কথাবার্তার মধ্য দিয়ে এক গূঢ়, উচ্চ আধ্যাত্মিক বার্তা পৌঁছে গেল বিশ্বের দরবারে, যা এককথায় অভিনব, অভূতপূর্ব ও অনন্যসাধারণরূপে বিশ্বজীবনের ইতিহাসে স্থান করে নিল। শ্রীমা ও

ঠাকুরের পরস্পরের প্রতি এই প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারলাম মা তাঁর স্বতন্ত্র সত্তা নিয়েই ঠাকুরের কর্মযজ্ঞে সহায়তা করবেন ও আমাদের জানাবেন জগতে মাতৃত্বের আদর্শ স্থাপনের জন্য ঠাকুর তাঁকে রেখে গেছেন। পরবর্তীতে স্বামী বিবেকানন্দ এ-তত্ত্ব জ্ঞাত হয়ে বিশ্বহিতকারী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে মা কালীর পাথরের প্রতিমার পরিবর্তে এই জীবন্ত মাতৃপ্রতিমাকে প্রতিষ্ঠা করে তাঁর হাতেই এর গতি, স্থিতি, বৃদ্ধি ও সর্বাত্মক অভ্যুদয়ের ভার অর্পণ করে দিলেন।

আমরা মায়ের জীবনীপাঠে বুঝতে পারি যে ঠাকুর নিজ জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার পূর্বেই মা তাঁকে জেনেছিলেন এবং স্বামীজীকে জগতের কাজে যুক্ত করবার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুর মাকেও ওই ভারটি নিতে বলেছেন। শ্রীশ্রীমাও স্বীকার করেছিলেন এই দায়। স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখেছেন যখন ঠাকুর কাশীপুরে অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন, তখন একদিন তিনি মার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন দেখে মা বললেন, ''কী বলবে, বলই না!'' ঠাকুর বললেন, ''হ্যাঁ গা, তুমি কি কিছু করবে না? (নিজের শরীর দেখিয়ে) এ-ই সব করবে?'' শ্রীমা উত্তর দিলেন, ''আমি মেয়েমানুষ, আমি কী করতে পারি?'' ঠাকুর তৎক্ষণাৎ বললেন, ''না, না, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে।'' আবার একদিন শ্রীমা খাবার নিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে ডাকলেন। তিনি যেন অনেক দূর থেকে এসে ভাবের ঘোরে বললেন, ''দেখো, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে, তুমি তাদের দেখো!'' একটু থেমে আবার বললেন নিজেকে দেখিয়ে, ''এ আর কী করেছে, তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে।'' ঠাকুর আরও বললেন, ''শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়।'' গম্ভীরানন্দজী 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থে এই অধ্যায়টির নাম দিয়েছেন 'ভারসমর্পণ'। মহারাজ আরও লিখেছেন, এই কাজের সূত্রপাত করতে, ''শুধু স্বরূপ স্মরণ করাইয়া বা বাক্য দ্বারা ভারার্পণ করিয়াই ঠাকুর নিরস্ত হইতেন না; তিনি ভক্তদিগকে মায়ের চরণে উপনীত করিয়া তাঁহার শক্তিবিকাশের ভূমি রচনা করিতেন।'' এই কালেই ঠাকুর মাকে তাঁর যুবক শিষ্য সারদাচরণকে মন্ত্রদান করতে আদেশ করেন। শ্রীশ্রীমাকে দিয়ে সঙ্ঘশক্তির ভিত্তি স্থাপন ও ভবিষ্যতে তার বিকাশের ভাবটি এর মধ্য দিয়েই সাধিত হয়েছিল বললে ভুল হবে না। মা পরে বলেছেন, ''যখন ঠাকুর চলে গেলেন, আমারও ইচ্ছা হলো, আমিও যাই। তিনি দেখা দিয়ে বললেন, 'না, তুমি থাক; অনেক কাজ বাকি আছে।' শেষে দেখলুম, 'তাই তো, অনেক কাজ বাকি আছে।' ''

স্বামী গম্ভীরানন্দ জানিয়েছেন, কালীপদ ঘোষ বা দানাকালী কুসঙ্গে পড়ে পারিবারিক জীবনকে বিপর্যস্ত করায় তাঁর স্ত্রী ঠাকুরের কাছে পরিত্রাণের জন্য এসে মন্ত্রপূত ওষুধ চাইলে, ঠাকুর মার কাছে তাঁকে পাঠান এই বলে যে তাঁর থেকেও শ্রীমার শক্তি অনেক বেশি, তিনিই এই বিষয়ে সাহায্য করতে পারবেন। কিন্তু মা এই কাজে গররাজি হয়ে মহিলাকে ঠাকুরের কাছেই পাঠিয়ে দেন। ঠাকুরও যথারীতি আবার শ্রীমার দ্বারস্থ হতে বলেন তাঁকে, এবং এভাবে দু-তিনবার ঘোরবার পর শ্রীমা ওই কাতর মহিলাটির প্রতি দয়াপরবশ হয়ে একটি পূজার

বেলপাতা দিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন, এতেই তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। এরপর ক্রমশ দানাকালী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যান, ঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়ে তাঁর অনুচরবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত হন, যা তিনি ইতিপূর্বে ভাবেননি।

এখানে আমাদের স্বতঃই মনে হয়, শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে কখনই এইসব মন্ত্রপড়া ওষুধপত্র, তাবিজ, কবচ কারুকে দেননি বা কখনই এসব সমর্থন করেননি; তাহলে মাকে কেন এ-ধরনের কাজে প্রবৃত্ত করলেন! পূর্বেই দেখা গেছে যে মা একটি মন্ত্র প্রয়োগ করে অসুখ ভাল করতে শিখেছিলেন। ঠাকুর সেকথা জানতে পেরে মাকে তৎক্ষণাৎ সেই শক্তি ঈশ্বরে সমর্পণ করে দিতে আদেশ করেন, যাতে মা কোনওদিন ওই সিদ্ধাই প্রয়োগ করতে না পারেন। ঠাকুর বলতেন, যে-কোনও সিদ্ধাই আধ্যাত্মিক জীবনের অগ্রগতি ব্যাহত করে। তাই প্রশ্ন জাগে যে কেন তবে ঠাকুর দানাকালীর স্ত্রীকে মন্ত্রপূত কিছু দিতে মাকে বাধ্য করলেন? নিজেই তো কৃপাবশে তা করতে পারতেন! এখানে উত্তরটি এইরকম হতে পারে যে ঠাকুর লক্ষ করেছিলেন শ্রীমার মধ্যে দুর্বল, উৎপীড়িত, অসহায় নারীদের জন্য বা সেই ধরনের ব্যক্তিদের জন্য একটি স্বতঃস্ফূর্ত সমবেদনা, বা এককথায় পরদুঃখ-কাতরতা রয়েছে, সেটিকেই যেন তিনি 'উসকে' দিতে চেয়েছেন, কারণ পরবর্তীতে শ্রীমাকে যে সর্বজনের পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে! স্বামী গম্ভীরানন্দজী এ-বিষয়ে আলোকপাত করে লিখেছেন, ''এই ঘটনা অবলম্বনে ঠাকুর শ্রীমায়ের কৃপাহস্ত উন্মোচিত করাইলেন।... ঘটনাটি আলোচনা করিয়া আমাদের স্বতঃই মনে হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের যুগধর্মস্থাপন-প্রচেষ্টার সহিত শ্রীমা, জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে, ক্রমেই অধিকতর সংশ্লিষ্ট হইতেছিলেন, আর এই শক্তিবিকাশের ধারা স্বভাবতই তাঁর মাতৃস্নেহের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে মিলিত হইয়া পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। মাতৃস্নেহের আকারে আকারিত করিয়াই শ্রীমা আপন অনন্ত শক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণের কার্যে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন।''

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমার যৌথজীবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ সম্বন্ধে এ এক অসাধারণ আলোকপাত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন অবলম্বনে জগন্মাতার জীবকল্যাণের যে-উদ্দেশ্য সফল হবে, সেই কর্মযজ্ঞে ঠাকুর স্বামীজীকে অংশগ্রহণ করাতে চেয়েছেন বহির্বিশ্বে তাঁকে প্রেরণ করে, যে-কথা তিনি নিজেই লিখেছেন, ''নরেন শিক্ষে দিবে, (যখন) ঘুরে বাইরে হাঁক দিবে।'' আর এই মহাকর্মের ভিতটি তিনি স্থাপিত দেখেছেন প্রথম থেকেই শ্রীমার দিব্য মাতৃশক্তির প্রকাশের মধ্যে, যার সাহায্যে মা আপনার সৃষ্টিশক্তিকে জগতে ওতপ্রোত দেখে আপন সন্তানজ্ঞানে সকলকে পরিচালন, ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করবেন। স্বামীজীও শ্রীমায়ের জীবনচর্যায় এই বিশ্বপালনকারী ঐশী মাতৃশক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকেই সঙ্ঘনেত্রীর পদে বরণ করে নিতে ইতস্তত করেননি। আমাদের ধারণা করতে বাধা নেই যে এই মহাশক্তি শ্রীমার তপস্যার দ্বারা অর্জিত ছিল না, কারণ মা শ্রীঠাকুরের মতন তেমন কোনও কৃচ্ছ্রসাধন বা তপস্যা করেননি। তিনি স্বয়ংসিদ্ধা ছিলেন।

এই দিব্য মাতৃশক্তির প্রেরণাতেই মা তাঁর কাছে আগত পরিচিত-অপরিচিত, ভক্ত-অভক্ত, সাধু- গৃহী, ভাল-মন্দ—সকলেরই সেবা করেছেন, শ্রীঠাকুরের জীবিতকালে ও তার পরেও, নিজের আহার-বিহার-বিনোদন, এমনকী স্বামীর দুর্লভ সঙ্গ না পাওয়ার কষ্ট গ্রাহ্য না করে। যেসব যুবক ভক্ত চিহ্নিত হয়েছিলেন সন্ন্যাসী হবেন বলে, ঠাকুর তাঁদের আহারাদি নিয়ন্ত্রণে রাখতে যত্নবান ছিলেন। কিন্তু মা সে-নিয়ন্ত্রণ মান্য না করে আহার্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে শ্রীঠাকুর অনুযোগ জানাতে

নহবতে মার কাছে গেছেন, মাও শান্তস্বরে এ-ব্যাপারে তাঁকে চিন্তা করতে বারণ করেছেন এই বলে যে এদের ভবিষ্যৎ তিনিই দেখবেন। এখানে শ্রীমার চরিত্রের কয়েকটি দিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক, মা অন্যের কল্যাণের স্বার্থে তাঁর স্বাধীন মনোভাব ব্যক্ত করতে কখনও ইতস্তত করতেন না, তাতে ঠাকুরের ইচ্ছাকে অতিক্রম করতে হলেও করেছেন। দুই, তিনি নিজ শক্তির ওপর যথেষ্ট আস্থাশীল, সর্বদা ঠাকুরের মুখাপেক্ষী নন। তিন, ঠাকুরের ভবিষ্যৎ কর্মধারার দায়িত্ব যে তিনি পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছেন, সেটি নির্দ্বিধায় ঠাকুরের কাছে ব্যক্ত করেছেন যে তাঁর ছেলেদের সাধুজীবনের দেখভালের জন্য তিনিই সজাগ থাকবেন। গম্ভীরানন্দজী লিখেছেন, শ্রীমা ছেলেদের ভবিষ্যৎ ত্যাগের জীবনের ভার নিয়েছেন জেনে ঠাকুর আশ্বস্ত হয়েই ফিরে গিয়েছিলেন একটিও বাক্য ব্যয় না করে; এবং শ্রীমা স্বেচ্ছায় স্বীয় ভাবী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন দেখে ঠাকুর নিশ্চয়ই সেদিন আনন্দিতই হয়েছিলেন। ঠাকুর, শ্রীমার বিকাশোন্মুখ অসীম শক্তির সঙ্গে পরিচয় থাকায়, নিজ কার্যভার এই মহাশক্তিরূপিণীর হতে তুলে দিতে ব্যস্ত হয়েছিলেন। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের ভূমিকা কিছু ছিল না, তিনি পরে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

আমরা এ-পর্যন্ত পর্যালোচনায় দেখলাম, সঙ্ঘভাবনার বীজটি যদি ঠাকুরের মনের গহনে ছিল, তবে তার অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল শ্রীমায়ের দ্বারা এবং তাকে সর্বব্যাপারে রক্ষা ও প্রতিপালন করার দায়িত্বেও তিনিই ছিলেন। যখনই সঙ্ঘের উচ্চ আদর্শ রক্ষায় কোনও সংকট দেখা দিয়েছে, তখনই শ্রীমা আপন বুদ্ধি, যুক্তি ও অলৌকিক ব্যক্তিত্বের দ্বারা তাকে সামলে দিয়েছেন। স্বামী প্রেমানন্দ এক পত্রে লিখেছেন, ''এ কি মহাশক্তি!... যে বিষ নিজেরা হজম করতে পাচ্ছিনে—সব মার নিকট চালান দিচ্ছি! মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন!... স্বয়ং ঠাকুরকেও এটি করতে দেখিনি! তিনিও কত 'বাজিয়ে বাছাই করে' লোক নিতেন!... আর এখানে—মার এখানে কি দেখছি? অদ্ভুত অদ্ভুত!! সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন।'' এ কি ছিল শুধু আশ্রয় দেওয়া! তা নয়, বলা যেতে পারে, তাঁর কাছে আগত সকলকেই তিনি শান্তি আনন্দ ও মুক্তির পথে এগিয়ে দিতেন। তাই তাঁর এই উদারতম বাণী—''আমি সতেরও মা, অসতেরও মা, ... আমার ছেলে ধুলো কাদা মাখলে আমাকেই কোলে তুলে নিতে হবে।'' স্বামী বিবেকানন্দ মায়ের এই চরিত্র-মহিমা উপলব্ধি করেই শিবানন্দজীকে আবেগাপ্লুত হয়ে লিখেছিলেন, ''দাদা জ্যান্ত দুর্গাপূজা করে দেখাব, তবে আমার নাম।'' স্বামীজী শরীর ত্যাগ করেছেন ১৯০২ সালে। শ্রীমা তারও পরে দীর্ঘ আঠারো বছর জীবিত ছিলেন। স্বামীজীর 'জ্যান্ত দুর্গাপূজা' করার তাহলে কী হল? এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে স্বামীজী বৃথা বাগাড়ম্বর করেননি। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার দিন— ১৮৯৭ সালের ১ মে সমগ্র রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের একচ্ছত্র নেত্রীপদে—ধর্মীয় ও ব্যাবহারিক উভয় ক্ষেত্রেই—তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস দিয়ে বরণ করে দুর্গাপূজাটি সমাপন করে গেছেন, যিনি অলক্ষে 'দশহাতে' এই সঙ্ঘকে রক্ষা করেছেন, আজও করে চলেছেন। তাই দেখি স্বামীজী তাঁর শপথটি পালন করেই লোকান্তরে গেছেন। আমরা যেন ভুলে না যাই যে শ্রীশ্রীঠাকুরও শ্রীমাকে ফলহারিণী কালীপূজার মাহেন্দ্রক্ষণে ত্রিপুরসুন্দরী- রূপে পূজা নিবেদন করেন। ইনি তো শ্রীদুর্গারই এক রূপ। শ্রীমার মধ্যে ওই শক্তির পূর্ণ অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেই ঠাকুরও যেন 'জ্যান্ত দুর্গা'র পূজাটি সমাপন করে তাঁর পদতলে তাঁর সবকিছু—দীর্ঘ তপস্যালব্ধ অমৃতফল সমর্পণ করে পরমানন্দ লাভ করেন।

গম্ভীরানন্দজী লিখেছেন, আমরা যেন এই ভ্রমে না পড়ি যে রামকৃষ্ণদেবের পূজায় ও শিক্ষাগুণেই শ্রীশ্রীমা জগদ্‌বরেণ্য হয়েছেন। মায়ের একনিষ্ঠ জীবনীপাঠক মাত্রই দেখেছেন যে তিনি জীবনের ঊষাকাল থেকেই মহিমান্বিতা—দেবীভাবেও মানবী ভাবেও। শ্রীঠাকুর শুধু আমাদের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ঘটিয়ে দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা ও নানা ঘটনার মাধ্যমে।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে অতি পরিণত, রুচিশীল, জ্ঞানঋদ্ধ, কর্মতৎপর শান্ত সৌজন্যপূর্ণ একটি মন প্রকাশিত হত। সেই সঙ্গে প্রকাশিত হত স্থানকাল-নির্বিশেষে করুণাপূর্ণ, অদোষদর্শী, ভাবালুতারহিত এক সাহসী স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, যিনি নিজ কর্তব্যবুদ্ধিতে সদা অটল, পুত্রবৎ সন্ন্যাসী সন্তানদের প্রতি যুগপৎ স্নেহ ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আবার তাঁদের ভ্রমপূর্ণ আচরণের সংশোধনে দৃঢ়চিত্ত, যেকোনও অবস্থায় যেকোনও আর্তের সহায়তায় উন্মুখ, সমভাবে সপ্রতিভ, কনিষ্ঠদের মতো বয়স্কব্যক্তিদের প্রতিও মাতৃভাবে ভাবিত। এমন এক বিরল শ্রেষ্ঠ নারীরত্নই তো রামকৃষ্ণ নামক 'the latest and the most perfect' অবতারের জীবনসঙ্গিনী হওয়ার ও তাঁর পূজা পাওয়ার যোগ্য।

স্বামীজী শ্রীমায়ের এই অলৌকিক চরিত্রবৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করেই শিবানন্দজীকে লিখেছেন, ''মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, 'কো রামঃ?'... রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বলো, দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার দিয়ো।" আরও তীব্র আবেগের বশবর্তী হয়ে এমন একটি স্পর্ধিত বাক্য রচনা করেছেন চিঠিতে—''রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান ক্ষতি নেই, মাতাঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ।" এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই নারীজাতিকে অশিক্ষা ও সামাজিক বন্ধনদশার হাত থেকে মুক্ত করতে দয়ার্দ্র হৃদয়ে স্বামীজী চেয়েছিলেন শ্রীশ্রীমার উদার অধ্যাত্মজীবন ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে একটি স্ত্রীমঠও গড়ে উঠুক, যেখানে নিঃস্বার্থ সেবা ও তপস্যার ভাব অবলম্বনে কিছু শিক্ষিত ব্রতধারিণী মানুষের কল্যাণসাধনে রত থাকবেন। তাঁর সেই ভাবনার রূপায়ণে শ্রীসারদা মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও মহান উদ্দেশ্যসাধনে স্বাধীন অভিযাত্রায় নিঃশঙ্ক ও দৃঢ়চিত্ত রয়েছে।

ঊনবিংশ শতকে ধর্ম-সমাজ-শিক্ষায় জটিলতা, একদিকে হিন্দু পূজা-অর্চনায় জাতিভেদজনিত বিভিন্ন সংকীর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের বাহুল্য, সেইসঙ্গে বিদেশি শাসকদের চটকদার জীবনযাত্রা, ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব, শিক্ষিত অভিজাত ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের নানান প্রভাব জাতীয় জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। তার সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার জন্য স্বদেশি আন্দোলন—সহিংস, অহিংস দুইই—এইসব থেকে প্রাচ্যের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার ধারাকে অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন ছিল একটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, যা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয় সাধন করে, অতীত ও বর্তমানের ভাবধারার সম্মিলনে যুগোপযোগী জীবনব্যবস্থাকে সচল ও সফল করবে।

শ্রীশ্রীমার জীবনের ঘটনাপরম্পরা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি এই যুগোপযোগী ভাবধারাকে কত অনায়াসে নিজ সরল অনাড়ম্বর ধর্মীয় ভাবধারার অঙ্গীভূত করেও এক স্বতন্ত্র জীবনমহিমায় সদা স্থিত থেকেছেন। তৎকালে বিদেশি আবহাওয়ার প্রভাবে এদেশের শিক্ষায়, ধর্মাচরণে, সমাজব্যবস্থায় যে-নবজাগরণের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল, শ্রীমা তাঁর স্বভাবগত উদার মতকে তার সঙ্গে মিলিয়েই, যেন প্রাচ্য রক্ষণশীলতাকে প্রতীচ্যের স্বাধীন জীবনধারা সহ বুঝতে আগ্রহী ছিলেন। স্বামীজীর বিদেশগমনে সমুদ্র পেরিয়ে তাঁর যাত্রাকে তিনি উন্মুক্ত মনে সায় দিয়েছেন, যেকালে অতি শিক্ষিত ব্যক্তিও

কালাপানি পেরোনোকে মহাপাপ বলে গণ্য করতেন। স্বামীজীর জন্য ভারতে আসা বিদেশি ম্লেচ্ছ নারীদের গ্রহণ করতে তাঁর গৃহের অন্যান্য মহিলারা যখন আড়ষ্ট বা বিরূপ, তখন মা ওই বিদেশিনী কন্যাদের—মার্গারেট নোবল, মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতিকে সাদরে নিজগৃহে অভ্যর্থনা করেছেন, তাঁদের স্পর্শ করেছেন, এমনকী তাঁদের স্পৃষ্ট পাত্র থেকে প্রসাদও খেয়েছেন। তৎকালে এইসব কাজ, কলকাতার মতন শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থানেও অনেকে কল্পনা করতে পারত না। একটি বিদেশিনীকে দিয়ে ভারতীয় কন্যাদের শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় খোলা এবং শ্রীশ্রীমার তাঁর সঙ্গে এক গৃহে বাস—মায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন থেকেও তাঁর সঙ্গিনী গোলাপ-মা যোগীন-মা প্রমুখ মেনে নিতে অপারগ হয়েছিলেন। শ্রীমা কিন্তু এসব বাধা নিজ স্থির বুদ্ধি ও আচরণ দিয়ে অনায়াসে অতিক্রম করে স্বামীজীকে এক শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে স্বামীজীর ভবিষ্যৎ কর্মের পথে কোনও বিঘ্ন না ঘটে। তিনি ভগিনী নিবেদিতার পরিচয় দিয়েছেন অন্যদের কাছে এই বলে যে নিবেদিতা নরেনের মেয়ে, আমাদের দেশের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য নরেনের সঙ্গে এদেশে এসেছে কত কষ্ট স্বীকার করে। নিবেদিতার রান্না করা পরমান্ন পর্যন্ত মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদনে পরাঙ্মুখ হননি গোলাপ-মার তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও, এবং বলেছেন দৃঢ়স্বরে যে অন্যরা না খেলেও ঠাকুর ও তিনি ওই পায়েস গ্রহণ করবেন। এসবই তিনি করেছেন সঙ্ঘের উদারতার প্রসারে ও সংকীর্ণ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে যুক্তির নিরিখে পুনর্মূল্যায়নের দিকে চালিত করতে। স্বামীজী লক্ষ করেছিলেন শ্রীমার মধ্যে রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতার এক অপূর্ব সমন্বয়, যা সেইকালে কোনও অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ বিধবার ক্ষেত্রে একেবারেই অভাবনীয় ছিল।

প্রাচীন ধর্মীয় ধারা অনুযায়ী রোগী বা আর্তের সেবা সাধুসমাজের করণীয় বলে মনে করা হত না। সেই কারণে পথের পূতিগন্ধময় ভিখারি রোগীকে নিয়ে এসে তাকে শারীরিকভাবে সেবা দান করার যে-আদর্শ স্বামীজী তাঁর সঙ্ঘের সাধুদের গ্রহণ করিয়ে ঠাকুরের শিবজ্ঞানে জীবসেবাকে সার্থক রূপ দিতে চেয়েছিলেন, তাকে ঠাকুরের গৃহী শিষ্যরাও অনেকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। যেমন শ্রীম বা মাস্টারমশাই এই ভাবের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু আমরা দেখলাম কাশী সেবাশ্রমে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের আর্ত পীড়িতদের ঐকান্তিক সেবাদান দেখে মা মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, এখানে ঠাকুরের ঠিক কাজই হচ্ছে; এবং তাতে তিনি অর্থদান করেছিলেন।

আবার স্বামীজীর দুর্গাপুজোয় বলিদানের ইচ্ছাকে মা সমর্থন না করে বলেছিলেন সর্বভূতে অভয়দানই সন্ন্যাসীর কর্তব্য, তাই সন্ন্যাসিসঙ্ঘে বলিদান হতে পারে না। স্বামীজীরা মঠে কোনও গরিব কর্মচারীকে চুরির অপরাধে বরখাস্ত করলে সেই সংবাদ শুনে মা মন্তব্য করেন যে সাধুর আবার চাকর রাখা, আবার সে-চাকরকে মার—দুটিই অন্যায় কাজ। স্বামীজীরা মায়ের এই সময়োচিত সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ উপদেশ-নির্দেশে উপকৃত হতেন এবং কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতেন। কোনও সাধু অর্থাভাবে কোনও গৃহীর সঙ্গে তীর্থভ্রমণে যাচ্ছেন শুনে মা তাঁকে নিরস্ত করেন এই বলে যে গৃহীদের সঙ্গে সাধুর তীর্থভ্রমণ করা উচিত নয়, কারণ গৃহীদের জীবনযাপন, আচার-আচরণ সাধুর অনুকূল নাও হতে পারে, এবং তাতে সাধুর ধর্মজীবনের হানি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থে পড়ি, কোনও নতুন ব্রহ্মচারী মঠ-মিশনের বিভিন্ন সেবাকাজে অনিচ্ছুক হয়ে মার কাছে অনুযোগ করেন যে এই ধরনের

কাজ তাঁর বা অন্যেরও ধ্যানজপের হানি করছে বা আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের অন্তরায় হচ্ছে। তাই এগুলি না করলেই ভাল। শ্রীমা উত্তর দেন, কলিকালে অন্নগত প্রাণ, দিনরাত জপধ্যান করবার মানসিক ও শারীরিক শক্তি কোথায়? সুতরাং শুধু বসে না থেকে এই ধরনের কাজে ব্যস্ত থাকলে মনের প্রসার ঘটবে, আনন্দও পাওয়া যাবে। কিছু জনসেবার কাজ না করলে মানুষ সাধুদের বসিয়ে খাওয়াবে কেন? তাছাড়া 'হাওয়া গুনতে' কোথায় যাবে? মানুষের কল্যাণের জন্য কিছু কাজ করলে ধর্মজীবনের হানি হয় না। তাই তো নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' ভাবটি কার্যকরী করবার জন্য এইসব কাজের ব্যবস্থা করেছেন। মা স্বামীজীর কর্মোদ্যোগকে সর্বতোভাবে সমর্থন করেছেন যেখানে স্বামীজীর গুরুভাইয়েরাও প্রথমদিকে একে ভগবানলাভের অন্তরায় বলেই মনে করেছেন। পরে অবশ্য তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন এই নিষ্কাম জনসেবার উদ্যোগকে। শ্রীশ্রীমা কিন্তু একটিবারও স্বামীজীর এই শ্রমসাপেক্ষ সেবাসাধনার প্রতি সন্দিহান হননি বা এর বিরুদ্ধে এমন একটিও মন্তব্য করেননি যে ঠাকুরের এই অভিপ্রায় ছিল না, নরেন এইসব কাজ নিজে থেকে বাড়াচ্ছে, এর জন্য মঠের ছেলেদের জপধ্যানের সময় কমে যাচ্ছে বা তাদের ঈশ্বরলাভের পথে এগুলি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। উপরন্তু স্বামীজী বিদেশ থেকে ফিরে যখন কিছুটা অসহিষ্ণু হয়েই মাকে জানালেন যে তিনি যত তাঁর পরিকল্পনাগুলি দ্রুত বাস্তবায়িত করতে চাইছেন, তা যেন করে উঠতে পারছেন না (স্বামীজী হয়তো তখন মনে মনে জেনেছেন, তাঁর প্রয়াণের সময়ের আর বেশি দেরি নেই), তখন শ্রীমা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, "চিন্তা করো না। তুমি যা করেছ, আর যা করবে সবই চিরকালের জিনিস। এই কাজের জন্যই তুমি এসেছ।... স্থির জেনো, ঠাকুর শীঘ্রই তোমার ইচ্ছা পূরণ করবেন। দেখবে অল্পদিনের মধ্যে তোমার ভাব কার্যকরী হচ্ছে।" আমরা দেখছি মা স্বামীজীর জগৎকল্যাণপ্রকল্প রূপায়ণে, শিক্ষা, সেবাদানের ব্যাপারে সর্বদা সহায়তা করতে পাশে থেকেছেন, বিচারশীল নীতিনির্দেশ দান করেছেন—সমালোচনামূলক একটি কথাও অন্যদের উত্থাপন করতে না দিয়ে। ঠাকুর মার সম্বন্ধে বলেছিলেন, "ও কি যে সে, ও আমার শক্তি"; সেই অপার্থিব শক্তি শ্রীঠাকুরের মাধ্যমে শ্রীমাও যেন স্বামীজীতে সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। স্বামীজী সেকথা স্বীকার করেই বলেছেন যে শ্রীমার কৃপাতেই তিনি বিদেশে গিয়ে সহায়সম্বলহীন অবস্থাতেও বিশ্বআলোড়নকারী শক্তির বিকাশ দেখাতে সমর্থ হয়েছেন। শ্রীমার তাঁর প্রতি এই কৃপা স্মরণ করেই যেন স্বামীজী এই উক্তিটি করেছিলেন : "মার কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ বা রাখাল মহারাজ যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসসন্তানরূপে পরিচিত, তেমনভাবেই বলা যেতে পারে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ঠাকুরের 'ভাবজাত', এবং শ্রীশ্রীমা এই 'ভাবজাত' সন্তানটিকে লালন করেছেন নিভৃতে, নিজ মনের গভীরে, ঠাকুরের সঙ্গে যুগ্মজীবনের সূত্রপাত থেকেই; পরে তাকেই ঠাকুরের সহযোগিতায় পূর্ণরূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। এজন্যই ঠাকুরের মুখে তিনি শুনেছিলেন, তাঁকে অনেক কিছু করতে হবে; এ-ব্যাপারে শুধু ঠাকুরেরই দায় নয়, তাঁরও দায়। আরও লক্ষণীয়, শরীরত্যাগের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামীজীকে তাঁর অন্যান্য বৈরাগ্যবান যুবক শিষ্যদের দেখাশোনার কথা বলেছেন তাঁর অবর্তমানে, কিন্তু তাঁর বিয়োগে একেবারেই অসহায় হয়ে পড়বেন যিনি, যাঁর পিতৃগৃহ শ্বশুরগৃহ উভয়ই নিদারুণভাবে দরিদ্র, সেই তাঁর সহধর্মিণী সারদা দেবীকে দেখাশোনা করার কথা একবারও বলেননি। এখানে আমাদের ধারণা করে নিতে বাধা নেই যে

যিনি স্বয়ং 'ব্রহ্মশক্তি', যিনি স্বামীর জীবনলীলায় দিব্যশক্তিরূপে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর জীবনোদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করতে এসেছেন, তাঁকে আর অন্য শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে কেন? ঠাকুর হয়তো একথা ভেবেই তাঁকে একলা কামারপুকুরে থাকতে ও কারও কাছে 'চিৎহাত' করতে অর্থাৎ কারও সাহায্য নিতে নিষেধ করে গিয়েছিলেন। আমরা দেখি, যখন স্বামীজী বেলুড় মঠের জন্য জমি কিনে শ্রীমাকে সেটি দেখাতে নিয়ে যান, তখনও কিন্তু মা এই মনোভাব একবারও প্রকাশ করেননি যে ঠাকুরের সঙ্গে স্বামীজী যেন তাঁরও থাকবার ব্যবস্থা একটু করে দেন, কারণ তিনি ঠাকুর ছাড়া অন্যত্র থাকতে পারেন না। একথা উচ্চারণ করা তো দূরে থাকুক, এ-ভাবটি তিনি মনেও স্থান দেননি। যদি তা হত, তবে স্বামীজীর অন্তরে তার অনুরণন নিশ্চয়ই ধরা পড়ত। বরং শ্রীমার জীবনখানিকে গভীর ভাবনার আলোয় তুলে ধরলে এ-চিত্রটিই ধরা পড়ে যে শ্রীমা যেন প্রথম থেকেই স্বেচ্ছায় সব ভার বহন করে চলেছেন এবং তার একটি সুস্পষ্ট রূপ দিতে চাইছেন। তাই যখন তিনি বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের সন্ন্যাসীদের স্থায়ী আবাস দেখলেন তীর্থভ্রমণে গিয়ে, তখন ঠিক ওইরকমই আকাঙ্ক্ষা করলেন ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যসন্তানদের জন্য প্রাণের আবেগ ও প্রার্থনা নিয়ে। এর জন্য তিনি নিজের কোনও কৃতিত্ব দাবি করেননি, এবং সেই সময় স্বামীজী সঙ্ঘ সম্বন্ধে কোনও গঠনমূলক ধারণা তখনও গ্রহণ করেননি। শ্রীমা কিন্তু দেখছি অনাগত সঙ্ঘপ্রতিমাটিকে মনে স্থান দিয়ে তাকে গড়ে তোলার জন্য নিজেকে যেন বহুবিধ কর্মের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছেন, যেমন কলকাতায় ঘিঞ্জি এলাকায় এসে মাঝে মাঝেই থাকা, বিদেশিনীদের আপন করে নেওয়া, সাধুদের আদর্শানুগ জীবন গঠনে, স্বাস্থ্যরক্ষায় সময়োচিত উপদেশ নির্দেশ দেওয়া, শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করেও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা ও দীক্ষাদি দেওয়া ইত্যাদি। স্বভাবলাজুক, স্বল্পবাক নারীটি যেন নিজেকেও গড়ে তুলছেন নবযুগের ধর্মীয় সঙ্ঘের প্রয়োজন মেটাতে; নিজেকেও যেন প্রসারিত করে চলেছেন ক্রমশ। পরে তিনি ও সঙ্ঘ একাকার হয়ে গেছেন।

১৮৯০ সালে স্বামীজী প্রমদাদাসবাবুকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "তাঁহার [ঠাকুরের] আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত।" এখানে আমাদের মনে হয় ঠাকুরের, অর্থাৎ গুরুর আদেশটি কার্যকরী করাই ছিল স্বামীজীর জীবনপণ। এই কঠিন কর্মে যদি কেউ অনলসভাবে, সদা জাগ্রতচিত্তে স্বামীজীর পাশে থেকে থাকেন, এবং সর্বদা ঠাকুরের জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পতাকাটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় উড্ডীয়মান রাখতে সচেষ্ট হয়ে থাকেন, তবে অবশ্যই তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানি সারদা দেবী। মা তৎকালেই শ্রীঠাকুরের এই আন্তর্জাতিক সঙ্ঘটির মূল সুরটি যেন নির্ধারণ করেই গোলাপ মাকে বলেছিলেন যে ঠাকুর শাসন, তাড়ন দিয়ে তাঁর ছেলেদের বাঁধেননি, স্নেহ-ভালবাসা দিয়েই বেঁধেছিলেন। প্রসঙ্গটি ছিল এই, গোলাপ মা মায়ের বাড়ির নিচে সাধু-ব্রহ্মচারীদের উচ্চরোলে হাসিঠাট্টায় বিরক্ত হয়ে শ্রীমার কাছে অভিযোগ করে বলেছিলেন—ঠাকুরের কেমন কড়া শাসন ছিল, মার সেদিকে লক্ষ নেই। তিনি বলতে চেয়েছিলেন মা এইসব নবাগতদের শাসনে রাখেন না বলেই এরা এমন উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করছে। আবার কোনও সাধু প্রায়ই তীর্থভ্রমণে ইচ্ছুক দেখে মা তাঁকে বলেন : তীর্থে ঘুরে ঘুরে শক্তিক্ষয় না করে, ঠাকুরের সঙ্ঘে অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে মিলেমিশে কিছু কাজ করে একটি উচ্চ ভাব নিয়ে পড়ে থাকলেই ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া যাবে, জীবনও সফল হবে।

রামকৃষ্ণদেব দ্বৈতভাবে সাধনা শুরু করলেও

তিনি যে প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈতবাদী—তাঁর বিভিন্ন ও বিচিত্র ধর্মীয় সাধনার মূল সুরটি যে এই অদ্বৈততত্ত্বই—এই মহান গূঢ় সত্যটি শ্রীশ্রীমা-ই সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের জ্ঞাত করান নির্দ্বিধায় এবং সেইসঙ্গে আমাদেরও চিরকালের জন্য সংশয়ের পারে নিয়ে যান।

শ্রীমায়ের জীবনের এইসব ঘটনা, তাঁর উপদেশ-নির্দেশ, তাঁর জীবনযাপন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে মা যেন সঙ্ঘকে সন্তানবৎ পালন করে আসছেন, এবং সেই লক্ষ্যে সব কাজকর্ম, ভাবনা-চিন্তাকেও যেন গড়ে নিচ্ছেন। শ্রীমার চরিত্রে দুর্লভ কয়েকটি ভাবের সম্মিলন হয়েছিল, যা নারীপুরুষ নির্বিশেষে যেকোনও মানবচরিত্রেই বিরল। আধ্যাত্মিক ধ্যানমগ্নতার সঙ্গে ব্যাবহারিক বা সাংসারিক জগতের কর্মশীলতা ও দক্ষতা, অসাধারণ বৌদ্ধিক কুশলতার সঙ্গে শান্ত মাধুর্য ও নম্রতা, মাতৃত্বের অকৃপণ স্নেহময়তার সঙ্গে বিবেকজাত বিচারশীলতা, নিজেকে গৃহীর ভূমিকাতে রেখেই সন্ন্যাসী সন্তানদের যথোচিত মানমর্যাদা দান, আবার সঙ্ঘের আদর্শ ও স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে কখনও তাঁদের দৃঢ়চিত্তে বাধা দান—এইসব কাজ শ্রীশ্রীমাকে যেন এক অনন্যসাধারণ উচ্চতায় বিধৃত করেছে—যেখানে অনন্তপ্রেমময়ী মাতৃসত্তা এবং এক দায়িত্বশীলা ও কর্তব্যময়ী দৃঢ় ব্যক্তিত্ব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এ তাঁর তপস্যাপূত অর্জিত সম্পদ ছিল না, এই অপরূপ প্রজ্ঞাবান চরিত্রটি নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন ও অবতারবরিষ্ঠের জীবনসঙ্গিনী হয়েছিলেন। তাই প্রথম থেকেই তাঁদের উভয়ের জীবনের পরম উদ্দেশ্য জগতের হিতসাধন সমষ্টিগত প্রচেষ্টার দ্বারা, যার মূলে অধ্যাত্মসাধনা—ত্যাগ-বৈরাগ্য, সর্বভূতে নিঃস্বার্থ সেবা ও ঈশ্বরোপাসনা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই শ্রীশ্রীমা অতন্দ্র প্রহরীর মতো তাঁর শুদ্ধ পবিত্র মাতৃচরিত্রটি নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন; এক মুহূর্তের জন্যও তা বিস্মৃত হননি বা তা থেকে চ্যুত হননি। তাই নিঃসংশয়ে বলা যায়, শ্রীমা সারদা দেবী শুধু রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদি স্থপতিই নন, তিনি এর অন্তর্লীন সত্তা। ✠

এবার প্রচ্ছদ

স্বর্ণদিনটির দিকে মহাকাল ফিরে ফিরে তাকাবেন। ১ মে ১৮৯৭। ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজধানী কলকাতার বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে জন্ম নিল রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন। শ্রীরামকৃষ্ণের দিয়ে-যাওয়া নির্দেশাবলি আর পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতা মন্থন করে যে-সুধা সঞ্চিত হয়েছিল যুগাচার্যের অন্তরে, তারই বাস্তব রূপায়ণ এই সঙ্ঘ—'রামকৃষ্ণ মিশন' বা 'রামকৃষ্ণ প্রচার'—জগতের সার্বিক কল্যাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ অর্থাৎ 'LOVE personified'-এর ভাব প্রচার। ''মহাতরঙ্গ আসছে,... মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে। এখন এ জন্মে অনন্ত বিস্তার, তাঁর মহান্ চরিত্রের, তাঁর মহান্ জীবনের...। তাঁর ছেলেদের—গরিব-গুরবো, পাপী-তাপী, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত, তাদের সেবার জন্য যে যে তৈরী হবে, তাদের ভেতর তিনি আসবেন...''—এই ছিল সে-মহাপ্রচারের অগ্নি-আহ্বান। সে-অমোঘ প্রচারকে স্থায়ী রূপ দিতে গড়ে উঠল বেলুড় মঠ, যেখান থেকে উদ্‌গত মহাসমন্বয়ের কিরণে জগৎ প্লাবিত হয়ে যাবে। স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং চিত্ররূপ দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীকটির। তাতে হংস পরমাত্মার, সূর্য জ্ঞানের, প্রস্ফুটিত পদ্ম ভক্তির, তরঙ্গায়িত জলরাশি কর্মের এবং সবকিছুকে বেষ্টন করে থাকা সর্প যোগের প্রতীক; অর্থাৎ চারটি যোগের সমন্বয়ে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়। স্বামীজীর হাতে যেন সেদিন উড্ডীন হল এমন এক পতাকা, যা কখনও নমিত হবে না, যার বুকে খোদিত সমন্বয়ের বার্তা জগতকে সন্ধান দেবে শাশ্বত আনন্দ ও শান্তির।